অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এই কমিশনের ভূমিকা

৪৪.৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC—National Human Rights Commission)

আরও ভালভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন (Protection of Human Rights Act, 1993) পাস করে। এই আইনের ভিত্তিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটিকে অধিকতর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার জাতীয়স্তরে স্বশাসিত জাতীয় মানবাধিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি মানবাধিকার কমিশন গঠন করার জন্য ১৯৯৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি জরুরী আইন (ordinance) জারি করেন। সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য এই কমিশন গঠন করার ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর মানবাধিকার সংরক্ষণ বিল পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে বিলটি পাস হয়ে যায়। ১৯৯৪ সালের ৮ই জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদান করেন। আইনটিকে ১৯৯৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ভূতাপেক্ষ কার্যকর করা হয়। এই আইনের আওতায় 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' (NHRC—National Human Rights Commission) গঠনের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' হল একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থা নয়। এই কমিশন নতুন দিল্লী ভিত্তিক। কিন্তু কমিশনের কাজকর্ম ভারতব্যাপী সম্প্রসারিত।

কমিশনের উদ্দেশ্যসমূহ // মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার অনুসন্ধান, বিচারের জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আদালতে পেশ করা, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ করা প্রভৃতি পথে কমিশন মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করে। কমিশন দেশে মানবাধিকারের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে কাজ করে। জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকারসমূহ যেগুলি সংবিধানে স্বীকৃত, বা আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রসমূহে (covenants)-র অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতের বিচার বিভাগের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য, সেই সমস্ত অধিকার সংরক্ষণে কমিশন সক্রিয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র বলতে মূলত দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র (International Covenants)-এর কথা বলা হয়েছে। এই দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র হল : পৌর ও রাজনীতিক অধিকারসমূহের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র এবং আর্থনীতিক সামাজিক অধিকারসমূহের উপর আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র। ১৯৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা এই দুটি চুক্তিপত্র গ্রহণ করে। ভারত সরকার ১৯৭৯ সালের ১০ই এপ্রিল এই দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রকে স্বীকার করে নেয়।

এই কমিশন প্রতিষ্ঠার তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়। এগুলি হল : (১) মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদিকে সামগ্রিকভাবে ও সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহকে শক্তিশালী করে তোলা; (২) মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকারকে তুলে ধরার জন্য, সরকারের থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থায় বাড়াবাড়ির অভিযোগসমূহের ব্যাপারে নজর দেওয়া; এবং (৩) এবিষয়ে ইতিমধ্যে যে সমস্ত উদ্যাগ-আয়োজন গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য সম্পূরক ভূমিকা পালন করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন // জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সভাপতি সমেত মোট পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত। তা ছাড়া পদাধিকার-বলে তিনজন সদস্য কমিশনের অন্তর্ভুক্ত হন। এঁদের নিয়ে কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যা আট। সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে আইনে উল্লেখ আছে। (১) ভারতের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের ভিতর থেকে কমিশনের সভাপতিকে নিযুক্ত করা হয়। (২) সুপ্রীম কোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের ভিতর থেকে একজন সদস্য নিয়োগ করা হয়। (৩) যে কোন হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের ভিতর থেকে একজন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়। (৪) মানবাধিকারের ক্রিয়াকারী হিসাবে সুপরিচিত বা মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

ব্যক্তিবর্গের ভিতর থেকে দু'জন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়। (৫) পদাধিকারবলে কমিশনের সদস্য হল তিনজন : (ক) সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি, (খ) তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপ-জাতীয়দের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি এবং (গ) মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতি। তা ছাড়া কমিশনের একজন মহাসচিব (Secretary General) থাকেন। ভারত সরকারের সচিব পর্যায়ের একজন আধিকারিককে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। মহাসচিব হলেন কমিশনের প্রশাসনিক আধিকারিক। তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদন করেন এবং ক্ষমতা ভোগ করেন। এ ছাড়া একজন ডাইরেক্টর জেনারেল (তদন্ত) থাকেন। কমিশনের কাজকর্ম যাতে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়, সে বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করাই হল এই আধিকারিকের কাজ।

সমালোচকরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাংগঠনিক ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (১) কমিশনের পূর্ণ সময়ের সদস্যসংখ্যা পাঁচ। তার মধ্যে সভাপতি সমেত তিনজন আসেন উচ্চতর বিচার বিভাগীয় পদাধিকারীদের থেকে। তারফলে কমিশনের কাঠামোগত প্রকৃতি অনেকাংশে আইনমূলক হয়ে পড়েছে। যে ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমস্যাদি মূলত আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচিত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। এই অবস্থায় দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত উপেক্ষিত হয়। এ রকম হওয়াটা অনভিপ্রেত। (২) কমিশনের গঠন ব্যবস্থায় বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রধান বিচারপতির সম্মতি সাপেক্ষে কোন কার্যকালীন বিচারপতিকেও কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা যাবে। এই ব্যবস্থা কমিশনের সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী। কার্যকালীন কোন বিচারপতিকে নিযুক্ত করলে, তিনি অন্যান্য সদস্যদের থেকে অধিক গুরুত্ব পাবেন। এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। সেক্ষেত্রে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্ব-বিবাদের সৃষ্টি হবে। এ রকম অবস্থা কমিশনের সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী। (৩) কার্যকালীন কোন বিচারপতিকে কমিশনের সদস্য করার সিদ্ধান্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিরোধী। শাসন বিভাগ সময়-সুযোগ বুঝে এই অবস্থাকে ব্যবহার করতে পারে। তবে সুখের কথা সরকার কার্যকালীন কোন বিচারপতিকে কমিশনের সদস্য নিয়োগের পথে পা বাড়াননি।

নিয়োগ-পদ্ধতি // জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতিকে নিযুক্ত করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। কমিশনের সভাপতিকে নিয়োগ করার আগে রাষ্ট্রপতি একটি কমিটির কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করেন। এই কমিটি গঠিত হয় নিম্নোক্ত পদাধিকারীদের নিয়ে : (ক) প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীই হলেন এই কমিটির সভাপতি; (খ) লোকসভার স্পীকার; (গ) ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী; (ঘ) লোকসভার বিরোধী দলের নেতা; (ঙ) রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা; এবং (চ) রাজ্যসভার সহ-সভাপতি। এই কমিটির সুপারিশ ছাড়া রাষ্ট্রপতি কমিশনের সদস্যদের নিযুক্ত করতে পারেন না। তা ছাড়া সুপ্রীমকোর্ট বা কোন হাইকোর্টের কর্মরত কোন বিচারপতিকে কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করতে হলে ভারতের প্রদান বিচারপতির পরামর্শ নিতে হয়।

কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতি সমালোচকদের সাধুবাদ লাভ করেছে। নিয়োগ পদ্ধতি নিরপেক্ষ। ভারত হল একটি বহুত্ববাদী দেশ। মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে রাজনীতিক নেতানেত্রীদের ঐকমত্যের অভাব আছে; আছে উচ্চগ্রামের রাজনীতিক মতপার্থক্য। মানবাধিকারের সুরক্ষার কাজে কমিশনের সকল সদস্যের আন্তরিক অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার স্বার্থে দলমত নিরপেক্ষ নিয়োগ একান্তভাবে অভিপ্রেত।

আবার কমিশনের দক্ষতা ও কার্যকরিতা বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করার জন্য একজন মহাসচিব ও একজন ডাইরেক্টর জেনারেল (তদন্ত) নিয়োগের ব্যবস্থা বিশেষভাবে সাধুবাদযোগ্য। প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মহাসচিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অপরদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত অভিযোগ নিয়ে তদন্তকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদাধিকারীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এই দুই পদাধিকারীকে বাদ দিয়ে মানবাধিকার কমিশনের সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের কথা ভাবা যায় না।

সভাপতি ও সদস্যদের কার্যকাল // জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তবে পাঁচ বছরের কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে সভাপতির বয়স সত্তর হলে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কমিশনের সদস্যরাও পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। সদস্যরা অবসর গ্রহণের পর পুনরায় পাঁচ বছরের মেয়াদে নিযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু সত্তর বছর বয়সে উপনীত হলে কোন সদস্য স্বপদে আসীন থাকতে পারেন না, তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। অবসর গ্রহণের পর কোন সদস্য ভারত সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের অধীন পদে নিযুক্ত হতে পারেন না।

পদচ্যুতির পদ্ধতি // ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের অপসারিত করতে পারেন। দুটি ক্ষেত্রে বা কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁদের

অপসারিত করতে পারেন; (ক) প্রমাণিত অসদাচরণ বা দুর্নীতিমূলক ক্রিয়াকর্ম; এবং (খ) সদস্যের অসামর্থ্য। কমিশনের কোন সদস্যকে উপরিউক্ত যে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অপসারণের আগে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রীম কোর্টকে দিয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে হয়। সুপ্রীম কোর্টের অনুসন্ধানে অপরাধী সাব্যস্ত হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে পদচ্যুত করতে পারেন; অন্যথায় পারেন না।

কতকগুলি কারণের জন্য কমিশনের কোন সদস্য সদস্য থাকার পক্ষে অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন; (ক) কোন সদস্য যদি দেউলিয়া ঘোষিত হন; (খ) কমিশনের সদস্য থাকাকালীন যদি অন্য কোন চাকরি গ্রহণ করেন; (গ) অসুস্থতার কারণে কোন সদস্য শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়লে; (ঘ) আদালত কোন সদস্যকে বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন বলে ঘোষণা করলে বা কোন সদস্যের নৈতিক অপরাধের জন্য কারাদণ্ড হলে।

বেতন, ভাতা প্রভৃতি // কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাদি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ করে। কিন্তু নিয়োগের পরে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে এ সবের পরিবর্তন করা যায় না।

কমিশনের কাজকর্মে স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনের কার্যালয় // জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদর দপ্তর নতুন দিল্লীতে অবস্থিত। তবে সরকারের সম্মতি সাপেক্ষে কমিশন অন্যত্রও তার দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভা আহ্বান করেন সভাপতি। কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞাপিত করেন কমিশনের মহাসচিব।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা // দেশে গণতান্ত্রিক সরকারের কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। তারজন্য অন্যতম উপায় হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়। দেখা দরকার যে, সরকার যেন কমিশনের কাছে হস্তক্ষেপ না করতে পারে। ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সুরক্ষা আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদির মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের নিযুক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশের সুবাদে সুনিশ্চিত হয় যে, কমিশন হল একটি নিরপেক্ষ সংস্থা। জনসাধারণের চোখে কমিশন হল ন্যায়বিচারের আধার বিশেষ।

(খ) কমিশনের সদস্যরা নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁদের নিয়োগ চূড়ান্ত। কার্যকালীন সময়ে তাঁদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চাকরির শর্তাদি পরিবর্তন করা যায় না, অথবা কোন রকম অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে তাঁদের ঠেলে দেওয়া যায় না। ভয়ভীতিহীন ও চাপমুক্ত অবস্থায় কমিশনের সদস্যরা কার্য সম্পাদন করতে পারেন।

(গ) কমিশনের সদস্যদের সহজে অপসারিত করা যায় না। তাঁদের পদচ্যুতির পদ্ধতি অতিমাত্রায় জটিল। স্বভাবতই কমিশনের স্বাধীনতা সুনিশ্চত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পদমর্যাদা // জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ইতিমধ্যেই এক দশকের অধিককাল তার অস্তিত্বকে অতিবাহিত করেছে। মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কমিশনের সামর্থ্য, সদিচ্ছা ও সক্রিয়তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হল একটি বিধিবদ্ধ ও স্বাশাসিত সংস্থা। স্বাধীনভাবে এবং স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবেই কমিশন কাজ করে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে দায়ী যে কোন সরকার, সরকারী সংস্থা বা সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগকে প্রকাশিত করার ব্যাপারে দায়িত্ব কমিশনের উপর ন্যস্ত আছে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন, অপরাধীর শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারেও কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা আছে। এই উদ্দেশ্যে কমিশন সুপ্রীম কোর্টের কাছে বা যে কোন হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত যে কোন মামলায় কমিশন নিজেকে অন্যতম পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করতে পারে। ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। কমিশনের যাবতীয় কাজকর্ম আইনানুমোদিত। অনেকের অভিমত অনুযায়ী ভারতের এই কমিশন অন্যান্য দেশের মানবাধিকার কমিশনের থেকে অধিক ক্ষমতাশালী। কারণ ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশের সামরিক বাহিনীর কাজকর্ম নিয়েও তদন্ত করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী // ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সংরক্ষণ আইনের ১২ ধারায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ ও আলোচনা আছে। তদনুসারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কার্যাবলী সম্পাদন করে বা ক্ষমতা ভোগ করে।

এক : মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিষয়ে কমিশন যাবতীয় অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। এক্ষেত্রে কমিশন নিজের থেকে, অভিযোগের ভিত্তিতে বা প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন করতে পারে।

দুই : মানবাধিকারের লঙ্ঘন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে কোন সরকারী আধিকারিক বা কর্মচারীর কর্তব্য পালনের ব্যর্থতার বিষয়ে কমিশন অনুসন্ধান করে।

তিন : মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলার শুনানীতে কমিশন অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে কমিশন এ রকম পদক্ষেপ নিতে পারে।

চার : কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বা আটক ব্যক্তিবর্গের জীবনযাপনের মান বা অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য কমিশন কারাগারসমূহ পরিদর্শন করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ব্যাপারে কমিশন সুপারিশ করতে পারে।

পাঁচ : মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে সংবিধান বা আইনানুসারে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কমিশন পুনরীক্ষণ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলিকে অধিকতর সক্রিয় করার ব্যাপারে কমিশন প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে পারে।

ছয় : মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গী কার্যকলাপকে কমিশন পুনরীক্ষণ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকগুলিকে অপসারণের ব্যাপারে কমিশন সুপারিশ করতে পারে।

সাত : মানবাধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রসমূহ কমিশন পর্যালোচনা করে এবং দেশে সেগুলির রূপায়ণের ব্যাপারে সুপারিশ করে।

আট : মানবাধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণা কার্য পরিচালনাকে কমিশন উৎসাহিত করে।

নয় : নিজেদের মানবাধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কমিশন ধ্যান-ধারণাকে সঞ্চারিত করে।

দশ : মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কাজকর্ম ও ভূমিকাকে কমিশন উৎসাহিত করে।

এগার : মানবাধিকারের বিকাশের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। এবং এ বিষয়ে কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সামরিক বাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশন সে বিষয়েও অনুসন্ধান করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কমিশনকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। (ক) ক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন সরকারের কাছ থেকে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠায়। (খ) সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পাওয়ার পর কমিশন সে বিষয়ে মতামত ও সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর কোন রকম অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই বলে মনে করলে কমিশন সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ সমাপ্তি টানে। (গ) কমিশনের মতামত ও সুপারিশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করল সে বিষয়ে কমিশনের কাছে সরকারকে একটি প্রতিবেদন পাঠাতে হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যপদ্ধতি // মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে আসে। কমিশন সংশ্লিষ্ট অভিযোগসমূহের ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। (১) তদন্ত কার্য পরিচালনার পরে যদি প্রতিপন্ন হয় যে প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার বা সরকারী আধিকারিককে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে কমিশন নির্দেশ দিতে পারে। (২) মানবাধিকারের লঙ্ঘনের অবসানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত লেখ (writ) জারি করার জন্য কমিশন সুপ্রীম কোর্ট বা কোন হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। (৩) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারকে উপযুক্ত অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে কমিশন সংশ্লিষ্ট সরকার বা সরকারী আধিকারিককে নির্দেশ দিতে পারে। (৪) তারপর কমিশন তার সুপারিশসমূহ এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ প্রকাশিত করে। এইভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ // মানবাধিকার সম্পর্কিত বিদ্যমান অবস্থা এবং প্রাসঙ্গিক

সুপারিশসমূহ সম্পর্কে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং তা কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারসমূহের কাছে পেশ করে। প্রয়োজন বোধে কমিশন অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন বা যে কোন সময়ে মানবাধিকারের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠাতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পেশ করে। কমিশনের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারসমূহকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ও ব্যাখ্যা দিতে হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কোন সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে না পারলে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারকে কারণ দর্শাতে হয়।

মূল্যায়ন // উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা মূলত সুপারিশমূলক প্রকৃতির। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেওয়ার কোন ক্ষমতা কমিশনের নেই। আবার ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকেও আর্থিক বা অন্যবিধ প্রতিকার প্রদানের ক্ষমতাও নেই। কমিশনের সুপারিশসমূহ সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর বাধ্যতামূলক নয়। তবে কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে এক মাসের মধ্যে কমিশনকে জানাতে হয়। কমিশনের এক প্রাক্তন সদস্য মলিমথ (V.S. Malimath)-এর অভিমত অনুযায়ী কমিশনের সুপারিশসমূহকে সরকার সরাসরি এবং সামগ্রিকভাবে উপেক্ষা করতে পারে না। কমিশনের ভূমিকা সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদানমূলক। একথা ঠিক। এতদ্‌সত্ত্বেও কমিশনের পাঠানো বিষয়াদি সরকার বিচার-বিবেচনা করে দেখে। কমিশনের বাস্তব কর্তৃত্ব অস্বীকার করা যায় না। কোন সরকারই কমিশনের সুপারিশসমূহকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সুতরাং কমিশন একেবারে ক্ষমতাহীন এমন কথা বলা যায় না।

১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সংরক্ষণ আইনে প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত যাবতীয় অপরাধের সত্বর বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আজ পর্যন্ত ভারতের পনেরটির মত অঙ্গরাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গড়ে তোলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের নাম করা যায়।

মানবাধিকার কমিশনের সাফল্য // বিগত প্রায় চৌদ্দ বছরের ইতিহাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। সরকারের বিভিন্ন পরিকেন্দ্রে এবং জনসাধারণের মনে কমিশন মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে বিকশিত করেছে। ভারতে মানবাধিকারের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে কমিশন নিজেকে অভিভাবক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে। আবার অনেক সময় কমিশন নিজেই উদ্যোগী হয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে দ্রুত প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের সমস্যাদির সুরাহার ব্যাপারে কমিশন নিজেই সক্রিয় হয়েছে। তারফলে জনসাধারণের মধ্যে কমিশনের প্রতি মর্যাদাবোধ এবং নৈতিক সমর্থন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সরকারি ক্রিয়াকারীদের মধ্যেও কমিশনের প্রতি মর্যাদাবোধের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কমিশনের সুপারিশসমূহকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

ভারতের ক্রমস্তর বিন্যস্ত সমাজব্যবস্থায় আরোপিত সামাজিক অসামর্থ্যের কারণে কিছু কিছু মানবগোষ্ঠীর মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার স্বার্থে কমিশন নাগরিক সমাজের এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করে। অসরকারি সংগঠনসমূহের সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতিরেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানবাধিকারের সংরক্ষণ সম্ভব হত না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কমিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জনকল্যাণমূলক সংগঠনসমূহেরও সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে শিশু শ্রমিক, শিশু পতিতাবৃত্তি, মুচলেখা শ্রমিক, বৃহত্তর কোন কর্মকান্ডের কারণে উদ্বাস্তু মানুষজনের পুর্নবাসন, প্রসূতিদের সমস্যা, মানসিক ভারসাম্যহীনদের সমস্যা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কমিশন আজকাল মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত গাদাগাদা অভিযোগ পেয়ে থাকে। সরকারি বা বেসরকারি দিক থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ পক্ষসমূহ অধুনা অনতিবিলম্বে সমস্যাদির প্রতিকারের জন্য কমিশনের দ্বারস্থ হয়। বস্তুত সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজনের মধ্যে কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজনের মানবাধিকারের ব্যাপারে জনমত অধুনা অত্যন্ত সজাগ। সাম্প্রতিককালে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে মানবাধিকার সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়েও কমিশনের সাফল্য অনস্বীকার্য।

কমিশনের সক্রিয়তার সুবাদে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানবাধিকারসমূহ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। গোড়া থেকেই কমিশন বিভিন্ন বিষয়ে পথ নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কাছে প্রাসঙ্গিক নির্দেশসমূহ জারি করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়গুলি হল : সংশোধনাগারের সংস্কার সাধন; বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা; শিশুশ্রমের অবসান; পুলিশী ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ; রাজ্য স্তরে এবং মহানগরে পুলিশের সদর দপ্তরে মানবাধিকারের সেল গঠন; হাসপাতাল পরিষেবা; জাতপাত ও সম্প্রদায়গত হিংসা-হানাহানি; প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার; মানসিক ভারসাম্যহীনদের মানবাধিকার; যৌনকর্মী ও এড্‌স রোগাক্রান্তদের মানবাধিকার; মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও চুক্তিপত্রসমূহের বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সীমাবদ্ধতা // মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পথে প্রতিবন্ধকতা করে। কমিশনের সীমাবদ্ধতাসমূহ মূলত দ্বিবিধ : সাংগঠনিক ও কার্যসম্পাদন সম্পর্কিত।

সাংগঠনিক সীমবদ্ধতা // (১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের যথেষ্ট উদ্যোগ-আয়োজন সত্ত্বেও সকল অঙ্গরাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজ্য কমিশন গঠন করা সম্ভব হয়নি। এ রকম অবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ সরাসরি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে আসে, অথবা আসে না। এমতাবস্থায় কমিশনের সময়ে ও সামর্থ্যে টান পড়ে।

১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন মোতাবেক প্রতিটি জেলায় মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ বিষয়ে অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের আন্তরিকতার অভাব অনস্বীকার্য। এর দ্বারা মানবাধিকারের ব্যাপারে রাজ্য সরকারসমূহের নির্লিপ্ততা প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেক জেলায় বিশেষ মানবাধিকার আদালত প্রতিষ্ঠিত হলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনায় ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা সম্ভব হত। অন্যথায় মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ সাধারণ আদালতে যায়। সাধারণ আদালতের বিচার ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্য এবং দীর্ঘসূত্রিতা জনসাধারণের মনে হতাশার সৃষ্টি করে।

(৩) কমিশনের সদস্যরা সিলেকশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। এই সিলেকশন কমিটির নেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী। সদস্য নিয়োগের পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ বিশিষ্ট বেসরকারি সংগঠনসমূহ এবং ভারতের বারকাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এই পদ্ধতিতে অনুপস্থিত। অথচ সদস্য নিয়োগ পদ্ধতিতে দলীয় রাজনীতিক পক্ষপাতিত্বের প্রভাব সম্পর্কিত জনসাধারণের আশঙ্কাকে অপসারিত বা হ্রাস করার জন্য এ রকম বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিত্ব সাহায্য করত।

(৪) মানবাধিকার কমিশনের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে এবং কমিশনের কাছে দায়িত্বশীল নিজস্ব ও স্বাধীন অনুসন্ধানকারী কোন সংগঠিত ব্যবস্থা নেই। স্বভাবতই মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে কমিশনের ভূমিকার কার্যকারিতা হীনবল হয়ে পড়তে বাধ্য। এ দেশে পুলিশ ও সরকারের দিক থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘণের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। সুতরাং সরকারি কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনুসন্ধানে পুলিশ নিরপেক্ষ, আন্তরিক, সৎ ও সক্রিয় হবে এমন আশা করা অন্যায় হবে।

(৫) মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ পেশ করতে হয়। এক বছরের এই সময়সীমা নিতান্তই কম। অভিযোগ জানাতে সময়সীমা পেরিয়ে গেলে, তা মাপ করার ক্ষমতা কারুর নেই। এই বিলম্বের কারণে অনেক অভিযোগই বাতিল হয়ে যায়।

ভূমিকাগত সীমাবদ্ধতা // (ক) কার্যসম্পাদন ব্যবস্থায়ও কমিশনের সীমাবদ্ধতা আছে। কমিশনের ভূমিকা বা মতামত পরামর্শমূলক বা সুপারিশমূলক, বাধ্যতামূলক নয়। স্বভাবতই কমিশনের ভূমিকার কার্যকরিতা প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়। সরকারের অনিচ্ছুক দপ্তর বা আধিকারিক কমিশনের সুপারিশকে মর্যাদা দেয় না। তারফলে কমিশনের ভূমিকা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু কমিশনের কার্যকরিতা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। অধ্যাপক জোহারী (J.C. Johari) তাঁর *The Constitution of India— A Politico-Legal Study* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : ''The Commission, of course can be a suplicating litigant before the Supreme Court or a High Court and pray for appropriate directions or orders. That is what public spirited non-governmental organisations have been doing for years.''

(খ) অপরাধমূলক ক্রিয়াকারীর বিরুদ্ধে কমিশন বিভাগীয় তদন্তের ব্যাপারে সুপারিশ করে। কিন্তু সরকারী সংস্থা এবং দপ্তরসমূহ সাধারণত কমিশনের এই সমস্ত সুপারিশ উপেক্ষা করে।

(গ) কমিশনের ক্ষমতার এক্তিয়ারগত সমস্যাও আছে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে কমিশনের করার কিছু থাকে না। আমজনতার বিক্ষোভ-বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকার অনেক সময়ই সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে থাকে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটে। কিন্তু কমিশনের করার কিছুই থাকে না। নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার উদাহরণের অভাব নেই। জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড এবং অন্যান্য জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন মূলক কার্যকলাপ সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গী ও বিদ্রোহী কার্যকলাপ যে সকল অঞ্চলে সংগঠিত হয়, সেই সমস্ত জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনী সশস্ত্র অভিযান চালায়। তারফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর অল্পবিস্তর অত্যাচারের ঘটনা ঘটে।

কিন্তু এ প্রসেঙ্গ অন্য কথাও আছে। নিরাপত্তা বাহিনীকে বিপদের মুখোমুখী প্রবল মানসিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে জোহারী মন্তব্য করেছেন: ''It would have been better if a provision had been made for the cooption of a high ranking member of the defence forces as a member of this commission while dealing with complaints against the armed or security forces.''

মূল্যায়ন // মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধনের বিষয়টি বহুলাংশে একটি সাধারণ প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে; জীবনের বাস্তব বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়নি। বিগত বছরগুলিতে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজকর্ম বিবিধ প্রতিবন্ধকতার দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকারি ও বেসরকারি বিবিধ ভয়-ভীতির মোকাবিলায় মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনই হল সর্বাধিক বৃহৎ আশা ভরসা। ভারতে মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন (NHRC Act, 1994)-এর সীমাবদ্ধতা সমূহের অপসারণ এবং মানবাধিকার সংরক্ষণে সাফল্যের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই কমিটি গঠন করে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আহমেদি (A.M. Ahmadi)-কে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। তা ছাড়া আরও ছ'জন সদস্য নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির প্রতিবেদনে বহুবিধ সুপারিশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহের মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) জাতীয় এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনসমূহের আর্থনীতিক স্বাধিকার থাকা আবশ্যক। (খ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দু'জন বিচার বিভাগীয় এবং তিনজন বিচার বিভাগের বাইরের সদস্য থাকা দরকার। এদের মধ্যে একজন মহিলা হওয়া উচিত। (গ) সামরিক বাহিনীর সংজ্ঞা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সামরিক বাহিনী বলতে স্থলবাহনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে বোঝাবে; আধা-সামরিক বাহিনী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। (ঘ) মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে কমিশনের কাছে অভিযোগ পেশ করতে হয়। এই সময়সীমা পেরিয়ে গেলে অভিযোগ অগ্রাহ্য হয়ে যায়। সুপারিশ করা হয়েছে যে, এক বছরের সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ পেশ করতে না পারার পিছনে পর্যাপ্ত কারণ থাকলে অভিযোগ পেশ করার সুযোগ থাকতে হবে।

বিগত বছরগুলিতে মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা মোটামুটি সন্তোষজনক। মানবাধিকার লঙ্ঘন না করার ব্যাপারে কমিশন পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে কিছু নির্দেশ দিয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিতে হবে। আইন-শঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত আছে, তাদের অন্যায় আচরণের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে নিরপরাধ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য সত্বর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার মত মানবাধিকার কমিশনও হল একটি গর্ব করার মত বিষয়। অধ্যাপক জোহারী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ ''If India is proud of her strong and independent judiciary, it should feel the same in regard to this commission.''

৪৪.৯ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন (State Human Rights Commissions)

ভারতীয় পার্লামেন্ট ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (The Protection of Human Rights Act, 1993) প্রণয়ন করে। এই আইনেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এবং মানবাধিকার আদালত (Human Rights Courts) সম্পর্কে আলোচনা আছে। মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গঠন // মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের ২১ ধারা অনুসারে যে কোন রাজ্য সরকার নিজের রাজ্যের জন্য একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে পারে। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সভাপতি সমেত মোট পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিকে কমিশনের সভাপতি করতে হয়। এ ছাড়া বাকি চারজন সদস্য নিযুক্ত হন। আইনানুসারে তাঁদের মধ্যে (ক) একজন হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি; (খ) একজন বর্তমান বা প্রাক্তন জেলা জজ; এবং (গ) মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু'জন ব্যক্তি। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের একজন সচিব থাকেন। সচিবই হলেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক। সচিব কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করেন ও দায়িত্ব সম্পাদন করেন। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদর দপ্তরের স্থান রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতি // রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (১৯৯৩)-য়ের ২২ ধারায় আলোচনা আছে। রাজ্যের রাজ্যপালের সই ও সিলমোহর সম্বলিত নির্দেশপত্রের ভিত্তিতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি এবং চারজন সদস্য নিযুক্ত হন। তবে এ রকম প্রত্যেক নিয়োগের আগে রাজ্যপালকে একটি কমিটির কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ নিতে হয়। এই কমিটি গঠিত হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার স্পীকার, রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং বিধানসভার বিরোধী দলের নেতাকে নিয়ে। যে রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে, সেই রাজ্যে বিধান পরিষদের সভাপতি এবং পরিষদের বিরোধী দলের নেতাও সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য হবেন।

মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (১৯৯৩)-য়ের ২২(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ না করে হাইকোর্টের কোন কর্মরত বিচারপতি বা কর্মরত কোন জেলা জজ-কে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা যাবে না।

সদস্যদের অপসারণ পদ্ধতি // রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের অপসারণ পদ্ধতি সম্পর্কে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (১৯৯৩)-য়ের ২৩ ধারায় আলোচনা আছে। প্রমাণিত অপসারণ বা অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি বা কোন সদস্যকে অপসারিত করতে পারেন। কিন্তু তার আগে বিষয়টির তদন্তের জন্য রাষ্ট্রপতিকে বিষয়টিকে সুপ্রীম কোর্টের কাছে পাঠাতে হয়। সুপ্রীম কোর্ট নিয়মানুসারে সে বিষয়ে তদন্ত করে। অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট যদি তার প্রতিবেদনে বলে যে, সংশ্লিষ্ট কারণে সভাপতি বা কোন সদস্যকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার তা হলে রাষ্ট্রপতি অভিযুক্ত সভাপতি বা সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন [২৩(২) ধারা]।

তা ছাড়া নিম্নোক্ত কারণের জন্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের সভাপতি বা যে কোন সদস্যকে পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। এই কারণগুলি হল : (ক) দেউলিয়া বলে ঘোষিত হলে; (খ) কর্মরত অবস্থায় অন্য কোন সবেতন চাকরি করলে; (গ) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে কার্য সম্পাদনে অক্ষম হলে; (ঘ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক উন্মাদ বলে ঘোষিত হলে; অথবা (ঙ) নৈতিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত হলে [২৩(২) ধারা]।

সদস্যদের কার্যকাল // রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের কার্যকাল সম্পর্কে মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের ২৪ ধারায় আলোচনা আছে।

(১) কমিশনের সভাপতি পদে নিযুক্তির পর পাঁচ বছর অথবা সত্তর বছর বয়স এই দুটির মধ্যে যেটি কম হয় সেই সময়ের জন্য তিনি নিযুক্ত হন। তাঁকে সভাপতি পদে পুনরায় নিযুক্ত করা যায় না [২৪(১) ধারা]।

(২) কমিশনের সদস্যদের কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে আরও পাঁচ বছরের জন্য তাঁদের পুনরায় নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে বয়স সত্তর বছর হয়ে গেলে তাঁদের অবসর গ্রহণ করতে হয় [২৪(২) ধারা]।

(৩) অবসর গ্রহণের পর কমিশনের সভাপতি বা কোন সদস্য রাজ্য সরকারের অধীনে বা ভারত সরকারের অধীনে কোন কাজ করতে পারেন না [২৪(৩) ধারা]।

বেতন ও কাজের শর্তাদি // কমিশনের সদস্যদের বেতন ও কাজের শর্তাদি সম্পর্কে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (১৯৯৩)-য়ের ২৬ ধারায় আলোচনা আছে। কমিশনের সদস্যদের বেতন ও ভাতা এবং কাজের অন্যান্য শর্তাদি রাজ্য সরকার নির্ধারণ করে। কিন্তু নিযুক্তির পর সদস্যদের স্বার্থের বিরুদ্ধে বেতন, ভাতা বা কাজের শর্তাদির কোন পরিবর্তন করা যায় না।

বার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন // রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন সম্পর্কে 'মানবাধিকার সুরক্ষা আইন' (১৯৯৩)-য়ের ২৮ ধারায় আলোচনা আছে। ২৮(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজ্য কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে। তা ছাড়া জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয়ে জরুরী প্রতিবেদন পেশ করতে পারে। রাজ্য সরকার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক বা বিশেষ প্রতিবেদনকে রাজ্য আইনসভায় পেশ করে। রাজ্য কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছে তা রাজ্য আইনসভাকে অবহিত করতে হয়। রাজ্য কমিশনের সুপারিশ রাজ্য সরকার গ্রহণ না করে থাকলে, তার কারণও রাজ্য আইনসভাকে জানাতে হয়।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী // মানবাধিকার সুরক্ষা আইন (১৯৯৩)-য়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলাদাভাবে কোন আলোচনা করা হয়নি। মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের ২৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কিত কতকগুলি ধারা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই ধারাগুলি হল ৯, ১০, ১২-১৮।

মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের ১২ ধারায় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে নির্দেশ ও আলোচনা আছে। তদনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মত রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলী পরিচালিত ও সম্পাদিত হবে।

মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের ১৩ ধারায় কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মত রাজ্য মানবাধিকার কমিশন অনুসন্ধান পরিচালনা সম্পর্কিত ক্ষমতাসমূহ ভোগ করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মত রাজ্য মানবাধিকার কমিশনও কোন সমান্তরাল আদালত নয়।